মূল্যহীন বলা হয়। এই [illegible] ক্ষেত্রেই একই রকম ভাবে মূল্যায়ন বা মূল্যাবধারণ হয়। যখন কোন বস্তু বা কোন আচরণ কোন প্রাণী বা মানুষের উপকার সাধন করে, তখন সেই প্রাণী বা মানুষের কাছে সে মূল্যবান হয়। বস্তু বা আচরণের মূল্য সর্বদাই কোন প্রাণী বা মানুষের অভাব, অনটন, আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন সাপেক্ষ হয়। যে বস্তু আমার কোন অভাব বা প্রয়োজন মেটায় বা মেটাতে পারে, সেই বস্তু আমার কাছে উপকারী আর মূল্যবান। আমার অভাব বা প্রয়োজন মিটিয়ে ঐ বস্তু আমার সন্তোষ উৎপন্ন করে। এই 'সন্তোষজনকতাই' হল বস্তুর মূল্য। গরু ঘাসে মুখ দিয়ে চলে ; ঘাস গরুর অভাব মিটিয়ে গরুর কাছে মূল্যবান হয়। কুকুরের কাছে ঘাসের কোন মূল্য নেই ; তার কাছে মাংসখণ্ডই মূল্যবান। অসহায় বন্যাপীড়িত মানুষের উপকার করে বলেই ত্রাণকার্য মূল্যবান হয়। যে ছুরি পাতলা করে রুটি বা মাংস কাটতে পারে তা আমাদের আশু অভাব মিটিয়ে মূল্যবান হয়। তাই বস্তু বা মনুষ্যকৃতির সন্তোষজনকতাকেই মূল্য আখ্যা দেওয়া যায়।

মনে রাখতে হবে এই মূল্য সর্বদাই কোন চেতন প্রাণী বা মানুষের কোন অভাব, আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন সাপেক্ষ হয় বলে মূল্যকে আত্মগত[১] বলতে হয়। তবে আমাদের প্রয়োজন যে কোন বস্তুতেই মেটে না—এক বিশেষ ধর্মবান বস্তু বা আচরণই সেই প্রয়োজন মেটায়। কোন বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে আমরা বিশেষ ধর্ম বিশিষ্ট বস্তুকে নির্বাচন করি। মূল্য বা সন্তোষজনকতা সব বস্তুরই থাকে না। তাই মূল্য বিষয়গতও[২] বটে। স্বর্ণমুষ্ঠি তার নিজস্ব বিশেষ ধর্ম বলে আমাদের অভাব মেটায়। ধূলিমুষ্ঠির সেই ধর্ম নেই বলে সে আমাদের প্রয়োজন মেটায় না। তাই মূল্যকে আত্মগত এবং বিষয়গত উভয়ই বলতে হবে। মূল্য বিষয়নিষ্ঠ ধর্মের উপর নির্ভরশীল আত্মগত ধর্ম।

২. মূল্যের শ্রেণীবিভাগ

(ক) আত্মগত ও বিষয়গত মূল্য

মূল্যের ধারণাটি প্রথমত অর্থনীতির ধারণা। আমরা যখন কোন রুটির মূল্য বা শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করি তখন ঐ বস্তুগুলি কতটা পরিমাণে মানুষের অভাব মিটিয়ে সন্তোষজনক হয়, তার বিচার করি। টাকাকড়ির বিনিময়ে ঐ সন্তোষজনকতার পরিমাণ নির্ধারণ করলে, ঐ মূল্যকে

'দাম' বলে ; তবে দাম ঐ বস্তুর মূল্যের ওপর নির্ভর করে। রুটি, শ্রম, ঘরবাড়ি, টেলিফোন যন্ত্র প্রভৃতি বস্তুগুলিই মূল্যবান। তবু ঐ মূল্য মানুষের সন্তোষ উৎপাদন নিরপেক্ষ হয়ে থাকে না। এদিক থেকে 'মূল্য' আত্মগত। চন্দ্রপৃষ্ঠে কোন জিনিষের কোন মূল্য নেই। চন্দ্রপৃষ্ঠে কোন চেতন প্রাণী নেই বলে সেখানে কোন বস্তুর দ্বারা কারুর সন্তোষ-অসন্তোষ উৎপাদনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেবল কোন চেতন প্রাণীর কাছেই বস্তুর মূল্য থাকে ; তাই বিষয়গত ও আত্মগত মূল্য পরস্পর সম্পৃক্ত। তাজমহলের মর্মরের 'কাঠিন্য' যতটা মানুষের প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ গুণ, তার 'সৌন্দর্য' কিন্তু ততটা নয়। মানুষের সন্তোষ-অসন্তোষ নিরপেক্ষ হয়ে 'ভালোত্ব-মন্দত্ব', 'সুন্দরতা-অসুন্দরতা' থাকে না।

এই তৃপ্তি বা সন্তোষের সাহায্যে বিকল্প অবস্থার মধ্যে নির্বাচন হয়, আর তাতে মূল্যায়ন প্রকট হয়। একাধিক বিষয় বা কর্মধারার মধ্যে একটিকে বেছে নিলে, নির্বাচিত বিষয়কে মূল্যবান বলতে হয়। গরু ঘাসে মুখ দিয়ে চলে ; গরুর কাছে ঘাসের মূল্য রয়েছে, কিন্তু মাংসখণ্ডের কোন মূল্য নেই। আবার কুকুরের কাছে মাংসখণ্ড মূল্যবান, কিন্তু ঘাস মূল্যহীন। তবু মানুষ ও ইতরপ্রাণীর মূল্যবোধ এক নয়। ইতরপ্রাণীর মূল্যবোধ তাদের শারীরিক গঠনগত পার্থক্যের উপর নির্ভর করে, আর তাদের সহজাত প্রবৃত্তিই ঐ নির্বাচনের নিয়ামক হয়। গরু আর কুকুরের গঠনগত পার্থক্য, তাদের দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক চাহিদা, তাদের মূল্যায়নকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের মূল্যবোধ কিন্তু তার দেহজ স্বাভাবিক চাহিদার বিরোধী হতে পারে। মানুষের বেলা, ব্রত বা উপবাসের দিনে, ক্ষুধার মুখেও খাদ্যবস্তুর কোন মূল্য নেই। এই সচেতন মূল্যবোধের অভাব আছে বলেই ইতর প্রাণীদের কোন নৈতিক বা নান্দনিক জীবন নেই।

কোন কোন মানুষের আত্মগত মূল্যবোধ বিপথগামী হতে পারে। সাধারণতঃ সুস্বাস্থ্যকে প্রায় সকলেই মূল্যবান মনে করেন। তবে কোন কোন মানুষ হয়তো অবহেলায় স্বাস্থ্যবিধি পালন করেন না অথবা মদ্যপান ও অন্যান্য কুঅভ্যাসে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করেন। এ ক্ষেত্রে বলতে পারি মাতাল তার নিজ স্বাস্থ্যকে মূল্যবান না ভাবলেও, স্বাস্থ্যের বিষয়গত মূল্য রয়েছে। তাই কোন ব্যক্তিবিশেষের মূল্যায়ন নিরপেক্ষ হয়ে বিষয়গত মূল্য থাকতে পারে ; যদিও ঐ মূল্য সাধারণের মূল্যায়ন সাপেক্ষ হয়।

অর্থাৎ আমি যা পছন্দ করি তা প্রকৃতপক্ষে মূল্যহীন হতে পারে আর যা প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান তাকে আমি অবহেলা করতে পারি। তাই বিষয়গত ও আত্মগত মূল্যের প্রভেদ বেশ স্পষ্ট। বিষয়গত মূল্য গাছপালা, ইতরপ্রাণীদের বেলাতেও থাকে। সূর্যালোক গাছপালার পক্ষে, ঘাস গরুর পক্ষে মূল্যবান। কিন্তু উদ্ভিদ বা ইতরপ্রাণীর পছন্দ-অপছন্দ নেই ; তাই তাদের পক্ষে আত্মগত মূল্য নেই।

এই মূল্যায়ন প্রসঙ্গে স্যার ডেভিড রস আবার 'সন্তোষজনকতা' ও 'প্রশংসাযোগ্যতার' মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অনেক বস্তু সুখোৎপাদক হয়ে মূল্যবান হয়—টাকাকড়ি, বাড়িঘর, প্রতিশ্রুতি পালন প্রভৃতি। সুপ্রযোজিত নাটক, কোণারকের মন্দিরগাত্রের অপ্সরা-মূর্তির বঙ্কিম রেখাগুলিও সন্তোষজনক। কিন্তু কোন অনবদ্য, বিয়োগান্ত নাটক বা উপন্যাস হয়তো খুবই প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু ঐ বেদনাবিধুর রচনা ঠিক সুখোৎপাদক হয় না। অন্য দার্শনিকেরা হয়তো এ পার্থক্য মানবেন না। সোফোক্লিসের বিয়োগান্ত নাটক 'কিং অয়দিপুস' আমাদের বিমুগ্ধ করে—আঘাত দিয়েও সন্তোষজনক হয়।

(খ) নৈতিক ও অনৈতিক মূল্য

আমরা আগেই বলেছি যে মূল্যবোধক বিশেষণগুলি, ভালো-মন্দ, নৈতিক ও অনৈতিক, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে। যা কিছু কাম্য, যা কিছু সন্তোষজনক বা প্রশংসাযোগ্য তাকেই মূল্যবান বলতে হবে। টাকাকড়ির বিনিময়ে মূল্যবান পণ্য সংগ্রহ করা যায় ; তাই টাকাকড়ির 'বিনিময়' মূল্য থাকলেও নিজস্ব কোন মূল্য নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রখর বুদ্ধি, চাতুর্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য, ললিতকলা প্রভৃতি সবই মানুষের কাম্য বলে মূল্যবান। সুন্দর ছবি, গান, মূর্তি, কবিতা, নাটক প্রভৃতির সৌন্দর্য-মূল্য বা নান্দনিক মূল্য থাকে। আবার কোন পবিত্র বস্তুর যথা, তুলসীচন্দনের, ঠাকুরঘরের, মন্দির-মসজিদের, ধর্মীয় মূল্য থাকে। এই সমস্ত 'বিনিময়', 'নান্দনিক' বা 'ধর্মীয়' মূল্যের কোনটাই 'নৈতিক'-মূল্য নয়। নৈতিক মূল্য কেবলমাত্র মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মে বা তার চরিত্রে থাকে। ভালো কাজ আর ভালো মানুষের মূল্যই কেবল নৈতিক মূল্য হয়। নৈতিক-অনৈতিক সব মূল্যই যে বিদ্যার আলোচ্য বিষয় তাকে মূল্যবিজ্ঞান' বলে। নীতিবিদ্যা তার একটি শাখামাত্র।

মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম এবং যে নীতি বা বিধি অনুযায়ী ঐ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, একমাত্র তাদেরই নৈতিকমূল্য থাকবে। প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যমূলক কাজ, প্রতিবর্তক্রিয়ার মতো, হঠাৎ হয়ে পড়ে না ; সচেতন বা অবচেতন কোন না কোন নীতি' অনুযায়ী ঐ কর্ম সাধিত হয়। কর্ম অথবা কর্মের নীতি স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হয় বলে, কর্তাকে ঐ কর্ম বা কর্মনীতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাই সৎকর্মের জন্য প্রশংসা, অসৎকর্মের জন্য নিন্দা জমা হয়।

কোন বিশেষ স্থানে-কালে অনুষ্ঠিত কর্ম এবং ঐ কর্মের সাধারণ নীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। এতদুভয়েরই নৈতিক মূল্য থাকবে। ধরা যাক নন্দিতা অজয়কে কথা দিল সে অজয়কে বিয়ে করবে। নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও সে শেষ পর্যন্ত অজয়কে বিয়ে করল। নন্দিতা এই কাজটি স্বেচ্ছায় "করেছে"—কাজটা হঠাৎ 'হয়ে' পড়েনি। 'কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা উচিত' এই সাধারণ কর্মনীতি বা বিধি অনুযায়ী নন্দিতা নিজে করেছে এবং অবশ্যই সে ঐ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে! এই কাজে ভালো বা মন্দ যে ফল বা পরিণতি হোক না কেন তা নন্দিতাতেই অর্শাবে। নন্দিতার কাজটি এক বিশেষ কালে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে বিশেষ কাজ ; কিন্তু ঐ কর্মনীতিটি সাধারণ, কেননা ঐ নীতি অনুযায়ী আরও অনেকানেক ব্যক্তি নানা সময়ে একই ধারার কর্ম করতে পারবে। মানুষের কাজ অথবা কর্মনীতি উভয়ই 'ভালো-মন্দ', 'উচিত-অনুচিত', এবং মূল্যবান বা মূল্যহীন হয়। একেই নৈতিক মূল্য বলে। বুদ্ধি, চাতুর্য, সৌন্দর্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই মূল্যবান। এদের কোনটিই মানুষের কাজ অথবা কর্মনীতি নয় বলে, এদের মূল্য অনৈতিক। ভালো আপেল বা ভালো কলমের মূল্যও অনৈতিক। নিজের বা বহুজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আমার কর্মের আদর্শ, পরিণাম বা ফল হতে পারে ; কিন্তু কর্ম নয় বলে ঐ ফলের মূল্য অনৈতিক।

মানুষের কর্ম বা কর্মনীতি অসংখ্য হতে পারে। "সত্য বলা", "প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা", "নিষ্ঠুরতা বর্জন করা", "পরীক্ষায় নকল না করা", "বিবাহিতা পত্নীর ভরণ-পোষণ" প্রভৃতি নানাবিধ কর্মনীতিকে 'ভালো' বা 'উচিত' বলা হয়। আবার "অকারণে পরকে দুঃখ দেওয়া", "কথা দিয়ে কথা না রাখা", "মিথ্যে গালিগালাজ করা" প্রভৃতি নীতিকে দুর্নীতি বা মন্দ বলা

হয়। কর্মনীতি, ভিন্ন মানুষের ভিন্ন হয় বলে তাদের কর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়। "আমাকে যে আঘাত করবে তাকে আমি প্রত্যাঘাত করব" এই নীতি অনুযায়ী হয়ত কেউ কাজ করে। আবার শ্রীচৈতন্যের কর্মনীতি ছিল "আমাকে যে আঘাত করবে তাকে আমি ভালবাসব"। একমাত্র কর্ম এবং অথবা কর্মনীতি ভিন্ন অন্য সব কাম্য পদার্থের মূল্য অনৈতিক।

(গ) স্বকীয় ও পরকীয় মূল্য

এখন আমাদের স্বাধীন বা স্বকীয় মূল্য এবং আশ্রিত বা পরকীয় মূল্যের পার্থক্য বুঝতে হবে। যে বস্তু কাম্য বা ইষ্ট হবার জন্যে অন্য কোন কাম্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে না, তারই স্বাধীন বা স্বকীয় মূল্য থাকে। আর নিজস্ব মূল্য না থাকলেও যে বস্তু অন্য কোন ইষ্টলাভের সহায়ক বা উপায় হিসেবে কাম্য হয়, তাকেই আশ্রিত বা পরকীয় মূল্য বলব। উদাহরণের সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বুঝে নিতে হবে।

রোগমুক্তি আমাদের কাম্য। এই কারণে বিস্বাদ ঔষধও আমাদের কাম্য হয়। ঔষধ কেবল রোগমুক্তির উপায় হিসেবে কাম্য, কিন্তু নিজে নিজেই মূল্যবান নয়। এই উদাহরণে রোগমুক্তির মূল্য স্বকীয়, আর ঔষধের মূল্য আশ্রিত বা পরকীয়। দাঁতের ডাক্তার যখন রোগীর দাঁতে তুরপুন চালান, তখন কেবল সেই বেদনা পাবার জন্যেই রোগী বেদনা সহ্য করে না ; রোগী তার দন্তশূল নিরাময় হবে বলেই বেদনা সহ্য করে। কোন উদ্দেশ্য "খ"-কে যখন সাধন করতে উদযোগ করি, তখন হয়তো "ক"-কে উপায়রূপে গ্রহণ করি। এক্ষেত্রে "ক"য়ের মূল্য আশ্রিত আর ঐ মূল্য নির্ভর করে "খ"য়ের স্বকীয় মূল্যের উপর। যে পদার্থ আমার অভীষ্ট লক্ষ্যরূপে উপস্থিত থাকে তাই স্বাধীন আর যে তার সহায়ক তা আশ্রিত। যে লক্ষ্যের মূল্য অন্য কোন উচ্চতর মূল্যের উপর নির্ভর করে না, তাকেই 'স্বতোমূল্যবান' বলা যাবে। ঔষধ রোগমুক্তির উপায় ;-তাই তার মূল্য পরকীয়। আবার রোগমুক্তিও যদি অন্য কিছুর, স্বাস্থ্য বা আনন্দের সহায়করূপে গ্রহণ করি, তাহলে রোগমুক্তির মূল্যও আশ্রিত হয়ে যাবে আর সুখশান্তি হবে স্বতোমূল্যবান বা স্বাধীন।

মানুষের জীবনে অভীষ্ট এবং উপায়ের মধ্যে এক ক্রম দেখা যায় আর এই ক্রম সহজেই চরমতম, স্বতোমূল্যবান অভীষ্টে পৌঁছে যেতে পারে। লেখাপড়া করা পরীক্ষা পাশের উপায় ; পরীক্ষায় পাশ উচ্চতর পরীক্ষা পাশের উপায় ; তা আবার আত্মোন্নতির সহায়ক ; সে আবার আনন্দ লাভের উপায় হতে পারে। এই ক্রমে চরমতম সন্তোষ উৎপাদনকারী অভীষ্টের দিকে আমাদের অগ্রগমন। আজ যা স্বতোমূল্যবান কালই তা উচ্চতর আদর্শলাভের সহায়ক হয়ে আশ্রিত মূল্য হতে পারে। যার ওপরে মানুষের আর কিছুই কাম্য থাকতে পারে না তাকেই কেবল স্বতোমূল্যবান অবস্থা বলতে হবে। মনুষ্য জীবনের এই চরমতম অভীষ্ট নির্ণয় করা খুব সহজ নয়। এ বিষয়ে নানা দার্শনিক নানা মত প্রচার করেন। বেন্‌থাম, মিল, সিজ্‌উইক প্রমুখ নীতিবিদেরা আমাদের সকল কাজের একমাত্র অভীষ্ট সুখলাভ বা দুঃখ পরিহার বলে থাকেন। এই মতকে 'সুখবাদ' বলা হয়। এই মতে সুখই একমাত্র স্বতোমূল্যবান পদার্থ আর মানুষের সকল কর্ম সুখলাভের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়া উচিত। কর্মফল বা পরিণতির মূল্য স্বকীয় আর কর্মের মূল্য পরকীয় হয়। আবার অন্য দার্শনিকেরা বলেন মনুষ্যকৃতির চরমতম অভীষ্ট হলো সব মানবোচিত ধর্ম ও ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ। এই 'পূর্ণতাবাদ' কেবল সুখকেই স্বতোমূল্যবান বলে না। জি. ই. মুর ও র‍্যাশ্‌ডেলের 'আদর্শ উপযোগিতা'-

বাদও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরম মূল্য স্বীকার করে না। আবার অন্য একদল দার্শনিক নৈতিক কর্মকে কোন উচ্চতর আদর্শ বা উদ্দেশ্যাভিমুখী না বলে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনেরই গুরুত্ব স্বীকার করেন। এই মতে 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' করাই চরমতম নৈতিক মূল্য ; ঐ কাজে সুখ বা দুঃখ যে পরিণতি বা ফলই হোক্ না কেন, তার প্রতি কর্তাকে উদাসীন থাকতে হবে।

হয়েছে তা আবার পড়ে নিতে ...

"মূল্য" কথাটির বিভিন্ন অর্থ (Concept of Value)

"মূল্য", "মূল্যায়ন"—এ কথাগুলির সঙ্গে আমাদের সবাইর পরিচয় আছে। কেবল দার্শনিক আলোচনায় নয়, সাধারণ জীবনের কথাবার্তায়ও আমরা এ কথাগুলি ব্যবহার করি। যথা, আমরা বলি : গীতা একটি মূল্যবান গ্রন্থ ; জীবনানন্দের কবিতার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয় নি ; মানুষ জীবনে যে সব সৎকর্ম করে তার কী মূল্য, মৃত্যু হলেই ত সব শেষ।

কোনো পদার্থের মূল্যায়ন করে তা বাক্যে ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা

ভাল, সুন্দর, উৎকৃষ্ট, ন্যায্য, সত্য, যথার্থ

এ জাতীয় কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করি। এ জাতীয় বিশেষণ প্রয়োগ করে বলা হয়—কোনো কিছু মূল্যবান, কোনো কিছুতে অমুক মূল্য আছে। কিন্তু কেবল এ জাতীয় শব্দ দিয়েই যে আমাদের মূল্যায়ন ব্যক্ত হয় তা নয়। কেবল এ জাতীয় শব্দই মূল্যনিরূপক—এ কথা মনে করলে "মূল্য" কথাটি সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এ সংকীর্ণ অর্থে "মূল্য" মানে উৎকর্ষ, আর "মূল্যবান" মানে—যার উৎকর্ষ আছে, সন্তোষজনকতা আছে, যা শ্রেয় বা কাম্য। কিন্তু দার্শনিকরা মূল্য কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেন। এ অর্থে "মন্দ", "অসুন্দর"—এ সবও মূল্যনিরূপক বিশেষণ। সুন্দর বস্তুর যেমন মূল্য আছে, অসুন্দর বস্তুর তেমনি মূল্য (অভাবাত্মক মূল্য) আছে। সুন্দর, অসুন্দর একই মাপনীর (স্কেলের) দুই প্রান্ত। সেরূপ একই মাপনীর এক প্রান্তিক মূল্য ভালত্ব, অন্য প্রান্তিক মূল্য মন্দত্ব। যে মানদণ্ড অনুসারে কোনো কিছু ভাল, ঠিক সে মানদণ্ড প্রয়োগ করেই জানি অন্য কিছু মন্দ। কাজেই "ভাল" যেমন মূল্যনিরূপক, "মন্দ"ও তেমনি মূল্যনিরূপক বিশেষণ। একটা উপমা : বিজ্ঞানীরা উত্তাপ বলতে কেবল উষ্ণতাই বোঝেন না। তাদের প্রয়োগ অনুসারে—গলনাঙ্ক থেকে হিমাঙ্কের মধ্যবর্তী প্রত্যেক পর্যায়েরই উত্তাপ আছে, বরফেরও একটা উত্তাপ আছে। বিজ্ঞানীরা শূন্য ডিগ্রি উত্তাপের, —১, —২, —৩, ডিগ্রি উত্তাপের, কথাও বলেন। সে রকম সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে—অত্যন্ত সুন্দর, সুন্দর, মোটামুটি সুন্দর, অসুন্দর, কুৎসিত, অতিকুৎসিত—এ সবও এক জাতীয় মূল্যের মাত্রাভেদ বোঝায়। তাহলে

মন্দ, অসুন্দর, অপকৃষ্ট, অন্যায্য, অসত্য, অযথার্থ

এ সবও মূল্যনিরূপক বিশেষণ। "ভাল", "মন্দ", "সুন্দর", "অসুন্দর" প্রভৃতি মূল্যনিরূপক বিশেষণকে বলে বিচারজ্ঞাপক (critical) বিধেয় বা মূল্যনিরূপক বিধেয়। শ্রেয় বা কাম্য থেকে পৃথক করার জন্য "মন্দ", "অসুন্দর", "অপকৃষ্ট" প্রভৃতি শব্দ যে মূল্য (অভাবাত্মক মূল্য) বোঝায় তাকে অনেক সময় অপমূল্য (disvalue) বলা হয়।

আমরা দেখলাম, "মূল্য" কথাটি দু অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থে "মূল্য" মানে শ্রেয় বা কাম্য। আর ব্যাপক অর্থে "মূল্য" কেবল শ্রেয় বোঝায় না, অশ্রেয়ও বোঝায় ; কেবল কাম্য বোঝায় না, অকাম্যও বোঝায়। এ অর্থে যা অকাম্য বা পরিত্যাজ্য তাও মূল্য বলে গণ্য। যার সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকি, যাকে গ্রহণীয় মনে করি না বর্জনীয়ও মনে করি না, কেবল তাই এ অর্থে মূল্যহীন।

"মূল্য" কথাটি আর একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে মূল্যবান পদার্থকেই মূল্য বলে বর্ণনা করা হয়। যথা, এ অর্থে অন্নবস্ত্র হল মূল্য। আমরা বলি : অন্নবস্ত্রের মূল্য আছে। কিন্তু আলোচ্য অর্থে অন্নবস্ত্রই মূল্য। সেরূপ, এ ব্যবহার অনুসারে শিক্ষা, বাক্‌স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা—এ সবও মূল্য।

সাধারণত মূল্য বলতে কিন্তু বোঝায় কোনো ধর্ম—বস্তুগত ধর্ম বা বস্তুতে আরোপিত ধর্ম। যথা, সৌন্দর্য একটি ধর্ম—কারও কারও মতে বস্তুধর্ম, আর কারও কারও মতে বস্তুতে আরোপিত ধর্ম। আমরা "মূল্য" কথাটি এ অর্থে প্রয়োগ করব।

মূল্যের প্রকারভেদ

দার্শনিকরা দু রকম মূল্যের কথা বলেন : স্বগত (intrinsic) মূল্য আর পরতমূল্য (extrinsic, instrumental value)। যে পদার্থ স্বতঃমূল্যবান বলে গণ্য, যে পদার্থের নিজস্ব মূল্য আছে বলে মনে করা হয়, সে পদার্থের যে মূল্য তাকে বলে স্বগত মূল্য। আর নিজস্ব মূল্য না থাকলেও যে পদার্থ কোনো মূল্য—শ্রেয় বা কাম্য—লাভের জনক, তার যে মূল্য তাকে বলে পরতমূল্য। যথা, বেহালার নিজস্ব মূল্য নেই, তবু বেহালা মূল্যবান পদার্থ বলে গণ্য হয় এজন্য : বেহালা দিয়ে সংগীত সৃষ্টি করা যায়, এবং সঙ্গীত স্বগতমূল্যবান। সঙ্গীত নামক মূল্যবান পদার্থটি সৃষ্টির উপায় হিসাবেই বেহালার মূল্য। মনে রাখতে হবে—কোন পদার্থ পরতমূল্যবান তা নির্ভর করে কোন পদার্থকে স্বগতমূল্যবান মনে করি তার ওপর। যথা, যদি কেউ মনে করে যে, সংগীতেরও নিজস্ব মূল্য নেই, সংগীত যে আনন্দদান করে সে আনন্দই মূল্যবান, তাহলে তাকে বলতে হবে সঙ্গীতের যে মূল্য তা পরতমূল্য। সে রকম, কেউ মনে করতে পারে, ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বগত মূল্য আছে। কিন্তু কেউ মনে করতে পারে যে : ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বগত মূল্য নেই, এর ফলে যে আত্মবিকাশ হয় তাই মূল্যবান (স্বগতমূল্যবান) ; সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতার যে মূল্য তা পরতমূল্য।

যা সত্য, মঙ্গলময় ও সুন্দর তা সাধারণভাবে স্বগতমূল্যবান বলে গণ্য হয়। কেবল তাই নয়, বহু দার্শনিক মনে করেন যে—সত্যতা, মঙ্গল ও সৌন্দর্য (সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্) মানুষের পরম কাম্য পদার্থ (সুতরাং এ তিনটি মূল্য হল চরম মূল্য)। কাজেই তাদের মতে, এ কথাও বলা যায় যে, এ মূল্য তিনটিই স্বগত মূল্য, আর অন্য সব মূল্য হল পরতমূল্য।

২. বর্ণনাত্মক বাক্য ও মূল্যনিরূপক বাক্য

৩. ভূমিকা : মূল্য সম্পর্কে একটা প্রশ্ন

মূল্য কী? মূল্য বিষয়গত (মানে, বস্তুগত) ধর্ম? নাকি আত্মগত (মানে, মনোগত বা ব্যক্তিগত) ধর্ম? এ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে তিনটি মত দেখতে পাওয়া যায়।

(১) কারও কারও মতে : মূল্য সম্পূর্ণরূপে আত্মগত ধর্ম। যাঁদের এ মত তাঁরা বলবেন : ঐ বস্তুটি আমার ভাল লাগে বলে আমি বলি—বস্তুটি সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্য কোনো বস্তুগত ধর্ম নয়।

(২) কেউ কেউ বলেন : মূল্য সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত ধর্ম। যাঁদের এ মত তাঁরা বলবেন—কোনো বস্তুর লাল নীল হওয়া যেমন আমার বোধের ওপর নির্ভর করে না, সে রকম কোনো বস্তুর সুন্দর অসুন্দর হওয়াও আমার সন্তোষ অসন্তোষের, পছন্দ অপছন্দের, ওপর নির্ভর করে না।

(৩) কারও কারও মতে : মূল্য আত্মগতও বটে, বিষয়গতও বটে। এ মতে কোনো কিছুকে মূল্যবান মনে করতে গেলে, কোনো কিছুতে মূল্য দেখতে হলে, দরকার : প্রথমত, আমাদের আবেগ অনুভূতি—সন্তোষ অসন্তোষ, পছন্দ অপছন্দ ; দ্বিতীয়ত, এমন কোনো বস্তুগত ধর্ম যা আমাদের সন্তোষ, অসন্তোষ, ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, উৎপাদন করতে পারে। যথা, কোনো বস্তুর কোনো ধর্ম আমার সন্তোষ বিধান করে বলেই আমি বলি, বস্তুটি সুন্দর।

৪. ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদ ও আবেগসর্বস্ববাদ : মূল্য আত্মগত

অনেক দার্শনিকের মতে মূল্য কোনো বস্তুগত ধর্ম নয়, মূল্য হল সম্পূর্ণরূপে আত্মগত ধর্ম। অর্থাৎ মূল্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে আমাদের আবেগ অনুভূতির, কমনা বাসনার, সন্তোষ অসন্তোষের, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার ওপর, এক কথায়—আমাদের মনের ওপর। যথা, স্পিনোজা বলেন : মানুষ ভাবে, কোনো বস্তু ভাল বলেই সে বস্তুটি কামনা করে ; আসলে সে কামনা করে বলেই বস্তুটিকে ভাল বলে মনে করে। সেরূপ লোট্‌সা বলেন : বস্তুর মূল্য থাকে আমাদের সন্তোষবোধে বা আনন্দবোধে। আর সন্তোষবোধ বা আনন্দবোধ একান্তভাবে মনোগত ধর্ম। সুতরাং মূল্য হল মনোগত বা আত্মগত ধর্ম। তার মানে—বস্তুতে মূল্য নেই, মূল্যহীন বস্তুতে আমরাই মূল্য আরোপ করি। এ মতবাদকে বলে মূল্য সম্পর্কে ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদ বা মনসাপেক্ষতাবাদ*।

এ মতবাদের সমর্থনে বলা হয় মূল্যায়নের অনৈক্যের কথা। বলা হয় : দেখ কোনো বস্তু লাল না নীল, নরম না শক্ত—এ সব ব্যাপারে বিশেষ মতভেদ দেখা যায় না। কিন্তু কোনো বস্তু সুন্দর না অসুন্দর, কোনো কাজ ভাল না মন্দ, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। যা আমি ভাল মনে করি তা তোমার কাছে মন্দ, আমি যা সুন্দর মনে করি, হয়ত তোমার কাছে তা কুৎসিত। মূল্য যদি বস্তুগত ধর্ম হত তাহলে মূল্যায়নে এমন অনৈক্য, বা একরূপতার অভাব, দেখা যেত না। কিন্তু বস্তুত কী দেখি? দেখি, দেশভেদে কালভেদে, বা ব্যক্তিভেদে মূল্যবোধ বা মূল্যায়নও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কয়েকটি উদাহরণ। হাল আমলের যুবক-যুবতীরা যে পোশাককে বা যে আধুনিক গানকে আশ্চর্য সুন্দর মনে করে, প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধদের চোখে তা কুৎসিত, কুরুচিপূর্ণ। এক কালে এ দেশে গৌরীদান ও সতীদাহ প্রথা খুব ভাল বলে প্রশংসিত হয়েছে, পরবর্তী কালে (বা অন্য দেশে) তা বীভৎস বলে নিন্দিত হয়েছে। যে কাব্য, গল্প, উপন্যাস নাটকে এক কালে লোকে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা দেখত এখনকার লোক তার নামও জানে না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা ভারতচন্দ্রের রচনা আজকাল কে পড়ে?

---

* Subjectivist theory of value

উক্ত মতবাদের সমর্থন মেলে দৈনন্দির জীবনের ভাষায়। আমরা বলি : রুচি নিয়ে তর্ক হয় না, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। বলি : ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। ব্যক্তিভেদে রুচিও ভিন্ন, আর রুচিভেদে মূল্যায়নও ভিন্নরূপ হতে বাধ্য।

মূল্য সম্পর্কে উক্ত মতবাদটি সুপ্রাচীন। তবে নব্য দৃষ্টিবাদীদের ও সাম্প্রতিক কালের বিশ্লেষণবাদী দার্শনিকদের হাতে পড়ে মতবাদটি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। নতুন রূপটির নাম মূল্য সম্পর্কে আবেগসর্বস্ববাদ*। যাঁরা নব্য মতবাদটি প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে পুরোপুরি ঐকমত্য যে আছে তা নয়। বস্তুত বিভিন্ন আবেগসর্বস্ববাদী দার্শনিক এ মতবাদটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন। নিচে কয়টি আবেগসর্বস্ববাদী মত ব্যাখ্যা করা হল।

কেউ কেউ বলেন : মূল্যনিরূপক বাক্যে আমাদের পছন্দ অপছন্দ, নিন্দা প্রশংসা, অনুমোদন অননুমোদন—এ সব ব্যক্ত হয়। ধরা যাক, আমি বললাম :

মিথ্যা কথা বলা খারাপ।

এ মতে, আমার এ উক্তির অর্থ :

আমি মিথ্যা কথা বলা পছন্দ করি না, অনুমোদন করি না।

সেরূপ, আমি যদি বলি

নরহত্যা গর্হিত কাজ

তাহলে বুঝতে হবে যে, আমি বস্তুত বললাম :

আমি নরহত্যা অনুমোদন করি না, যে নরহত্যা করে তাকে ঘৃণা করি।

এ মতে মূল্যনিরূপক বাক্য আর বর্ণনাত্মক বাক্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই, মূল্যনিরূপক বাক্যও এক প্রকারের বর্ণনাত্মক বাক্য। তবে এ জাতীয় বাক্যে এদের বৈয়াকরণ উদ্দেশ্য পদ যা বোঝায় তার বর্ণনা থাকে না। এ জাতীয় বাক্যে বক্তারই মানসিক অবস্থা, প্রবণতা বা অনুভূতির কথা বলা হয়। ধরা যাক, রাম বলল :

কবিতাটি সুন্দর

প্রবঞ্চনা গর্হিত কাজ।

আলোচ্য মতে এ সব উক্তিতে কবিতা বা প্রবঞ্চনা বর্ণিত হয় নি, এতে রামেরই মানসিক প্রবণতার—পছন্দ অপছন্দের, কথা বলা হয়েছে। 'আমি সুখী' বললে যেমন আমার মনোভাব বর্ণনা করা হয়, সে রকম আমি যদি বলি 'এ কাজটি ভাল', 'ঐ বস্তুটি সুন্দর' তাহলে আমারই মনোভাবের, পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির, বর্ণনা দেওয়া হয়। এ কাজটি বা ঐ বস্তুটি সম্পর্কে কিছু বলা হয় না।

কেউ কেউ বলেন : মূল্যনিরূপক বাক্যে যে কেবল বক্তার মনোভাবের (আবেগ অনুভূতির) বর্ণনা থাকে, তা নয়। এরূপ বাক্যের সাহায্যে বক্তা শ্রোতার মনে বিশেষ ধরনের মনোভাব উদ্রেক করতে চায়—শ্রোতাকে কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে বা কোনো কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চায়। ফলে এরূপ বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে অনুজ্ঞাও প্রচ্ছন্ন থাকে। এ মতে—মূল্যনিরূপক বাক্যে যা বলা হয় তার দু অংশ : এক অংশ হল বক্তার মনোভাবের বর্ণনা, আর অন্য অংশ হল অনুজ্ঞা। যথা, এ মতে—

মিথ্যা কথা বলা খারাপ = আমি মিথ্যা কথা বলা অনুমোদন করি না
(মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করি)
তুমিও মিথ্যা কথা বলবে না।

আবার কেউ কেউ বলেন : মূল্যনিরূপক বাক্যে মূল্য নামক কোনো বাস্তব ধর্মের কথা ত বলাই হয় না, এমন কি এরূপ বাক্য বক্তার আবেগ অনুভূতিরও বর্ণনা নয়, [illegible] অনুজ্ঞা বাক্যও নয়। মূল্যনিরূপক বাক্য প্রয়োগ করে বক্তা তার মনোভাব বর্ণনা করে না, মনোভাব প্রকাশ করে (ব্যক্ত করে বা প্রদর্শন করে)। বর্ণনা করা আর প্রকাশ করার পার্থক্য** লক্ষণীয়। একটা উদাহরণ দিলে বর্ণনা আর প্রকাশের পার্থক্য বোঝা যাবে। ধরা যাক, খেলার মাঠে ইস্টবেঙ্গলের জেতা দেখে কেউ বলল : আমি খুব খুশি

---

* Emotive theory of value

** "to describe" ("description") আর "to express" ("expression")-এর পার্থক্য

হয়েছি, আমার খুব আনন্দ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বক্তা তার মনোভাবের বর্ণনা দিল। আর একজন 'মরি মরি!' 'বাহবা!' 'সাবাস!' 'আহা' 'আহা!' 'ইস্টবেঙ্গলকী জয়!' বলে হৈ হুল্লোড় শুরু করল, আকাশে জুতো ছাতা ছুঁড়ে দিল, খবর কাগজ জ্বালিয়ে মশাল তুলে ধরল, বা উদ্বাহু হয়ে নাচতে শুরু করল। এ ব্যক্তির বেলায় বলব : ও ওর আবেগ প্রকাশ করছে। সে রকম 'আমি কষ্ট পাচ্ছি' বললে বক্তার অনুভূতি বর্ণনা করা হয়। কিন্তু কষ্ট পেয়ে গোঙালে—ঐ অনুভূতি ব্যক্ত করা হয়, প্রদর্শন করা হয়। সে রকম, আমার রক্তচক্ষু বা বদ্ধমুষ্টি আমার ক্রোধের প্রকাশ, কিন্তু 'আমার রাগ হয়েছে' এ বাক্য আমার বিশেষ আবেগের বর্ণনা।

যাঁরা মনে করেন মূল্যনিরূপক শব্দ প্রয়োগ করলে কেবল আবেগের প্রকাশ করা হয় (কিছুর বর্ণনা দেওয়া হয় না) তাঁরা বলেন : কোনো নির্দেশক বাক্যে কোনো মূল্যনিরূপক শব্দ যোগ করলে বাক্যটির অর্থের কোনো তারতম্য হয় না। যথা, নব্য দৃষ্টিবাদী এয়ার বলেন

তুমি টাকা চুরি করে খারাপ কাজ করেছ

এ কথা যদি বলি, তাহলে

তুমি টাকা চুরি করেছ

এ কথার চেয়ে বেশি কিছু বলা হয় না। কাজেই অর্থের দিক থেকে বাক্য দুটির মধ্যে পার্থক্য নেই। তবে প্রথম বাক্যটিতে আমার আবেগ (নিন্দা, ঘৃণা), প্রকাশ পেয়েছে। এ বাক্যের দু অংশ : (১) তুমি টাকা চুরি করেছে, (২) এ কাজটা খারাপ। প্রথম অংশ কোনো বাস্তব ঘটনার বর্ণনা, আর দ্বিতীয় অংশটি বক্তার আবেগের প্রকাশ। 'খারাপ কাজ করেছ' এ কথা না বলেও আমার আবেগ প্রকাশ করতে পারতাম—পারতাম ঘৃণাসূচক বা বিস্ময়সূচক কোনো শব্দ ব্যবহার করে, কোনো দৈহিক অভিব্যক্তি দিয়ে, বা বিস্ময়চিহ্ন প্রয়োগ করে। যথা, লিখতে পারতাম—

তুমি টাকা চুরি করেছ—ছি ছি

বা তুমি টাকা চুরি করেছ!!!

মূল্য সম্পর্কে ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদের ও আবেগসর্বস্ববাদের সমালোচনা

মূল্য সম্পর্কে ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদের, এবং এর সাম্প্রতিক রূপ—আবেগসর্বস্ববাদের, বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে : এ মতবাদ মূল্যায়নের একরূপতা ব্যাখ্যা করতে পারে না। ব্যক্তিভেদে রুচিভেদে মূল্যায়ন ভিন্নরূপ হতে পারে—এ কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু অনেক ব্যাপারে মূল্যায়নে যে মোটামুটি একটা একরূপতা দেখা যায়—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যথা, সাধারণভাবে সাধারণ অবস্থায় সব সময় সব সভ্য দেশে, সত্য কথা বলা (পরোপকার করা) ভাল বলে প্রশংসিত, আর মিথ্যা কথা বলা (বা বিশ্বাসঘাতকতা করা) মন্দ বলে নিন্দিত হয়ে আসছে। গৌতম, শংকরাচার্য, প্লেটো, আরিস্টটল্ মহৎ দার্শনিক বলে, বুদ্ধ, খৃস্ট মহাত্মা বলে, সর্বকালে সর্বদেশে বন্দিত হয়েছে। বাল্মীকি, কালিদাস, শেক্সপীয়র, টল্স্টয়—এদের রচনা সব দেশে সব কালে সাধারণভাবে সমাদৃত হয়েছে। মূল্য যদি কেবল আত্মগত হত তাহলে কোনো নীতিসূত্র, সাহিত্য বা শিল্পকর্ম সর্বকালে সর্বদেশে সমাদৃত হত না।

তারপর, প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্যবোধ ও মূল্যায়ন ভিন্ন ভিন্ন—এ কথা যদি মেনে নিই তাহলেও প্রশ্ন ওঠে : একই ব্যক্তি একই বস্তু বা কাজকে সব সময় সব অবস্থায় ভাল বা সুন্দর (মন্দ বা অসুন্দর) বলে গণ্য করে কেন? বস্তুর বা কাজের মধ্যে সমাদর (অনাদর), প্রশংসা (নিন্দা) আকর্ষণ করার মত কোনো বস্তুগত ধর্ম না থাকলে বক্তা "সুন্দর", "ভাল" ("অসুন্দর", "মন্দ")—এ সব বিশেষণ প্রয়োগ করবে কেন? যে ব্যক্তি মূল্যনিরূপক বাক্য প্রয়োগ করে সে বস্তুত মনে করে না যে, সে তার নিজের মনোভাবের বর্ণনা দিচ্ছে বা তার মনোভাব ব্যক্ত করছে। সে বিশ্বাস করে—মূল্যায়িত বস্তু বা কাজে এমন কোনো ধর্ম আছে যা তার বিশেষ আবেগ অনুভূতি উৎপাদন করে। মূল্যনিরূপক-বাক্যের সব বক্তার এ বিশ্বাসটি ভ্রান্ত — এ

কথা মানা যায় বলে মনে হয় না। মূল্যনিরূপক ও বর্ণনাত্মক বাক্যের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে উদাহরণ দিয়ে আমরা বলি :

এ ফুলটি লাল—বর্ণনাত্মক

এ ফুলটি সুন্দর—মূল্যনিরূপক

আরও বলি : লাল রঙ ফুলটির যেমন-ধর্ম, সৌন্দর্য ঠিক তেমন-ধর্ম নয়। কিন্তু এ কথা মানতে হবে যে, ফুলটিতে এমন কোনো বস্তুগত ধর্ম আছে যা দেখি বলেই, বলি 'এ ফুলটি সুন্দর'। আরও একটা কথা। বিজ্ঞানীরা বলেন, ফুলেতে যে-লাল রঙ দেখি তাও ফুলেতে ঐভাবে থাকে না। এতে থাকে লাল রঙের বোধ উৎপাদনকারী কোনো শক্তি। এ শক্তিটি কিন্তু রক্তবর্ণ নয়। বস্তুত এ শক্তিটি হল এক বিশেষ পরিমাপের তড়িৎ-চুম্বকীয়*-তরঙ্গ উৎপাদনকারী শক্তি। অনুরূপভাবে বলা যায়, ফুলটিতে সৌন্দর্যবোধ-উৎপাদনকারী কোনো শক্তি আছে। এখন, লাল রঙকে যদি আত্মগত ধর্ম না বলি, তাহলে সৌন্দর্যকেই বা আত্মগত ধর্ম বলব কেন?

উক্ত মতের বিশেষত আবেগসর্বস্ববাদের, বিরুদ্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হল এই : এ মতবাদ যদি সত্য হত তাহলে মূল্য নিয়ে বিতর্ক বা মতবিরোধ হতে পারত না—দুটি মূল্যনিরূপক বাক্যের মধ্যে বিরুদ্ধতার সম্বন্ধ থাকত না। কিন্তু বস্তুত মূল্য নিয়ে মতবিরোধ হয়—দুটি মূল্যনিরূপক বাক্যের মধ্যে বিরুদ্ধতার সম্বন্ধ থাকতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। মনে করা যাক,

রাম বলল : এ বামপন্থী সরকারের সব কাজ ভাল (১)

শ্যাম বলল : এ বামপন্থী সরকারের কোনো কোনো কাজ ভাল নয় (২)

এখানে রামের উক্তি ও শ্যামের উক্তি স্পষ্টতই পরস্পরবিরুদ্ধ। এ মত দুটির বিরোধ নিয়ে বাদানুবাদ হতে পারে, এমন কি মারামারিও হতে পারে। আবেগসর্বস্বাদীদের মতে, বস্তুত

রামের বক্তব্য হল : এ বামপন্থী সরকারের সব কাজ আমি অনুমোদন করি (পছন্দ করি) (১´)

শ্যামের বক্তব্য হল : এ বামপন্থী সরকারের কোনো কোনো কাজ আমি অনুমোদন করি না (পছন্দ করি না) (২´)

এখানে (১´) (২´)-এর মধ্যে বিরুদ্ধতার সম্পর্ক নেই, 'আমি—অনুমোদন করি (পছন্দ করি)' এবং 'ও—অনুমোদক করে না (পছন্দ করে না)' এরূপ উক্তির মধ্যে মতবিরোধ থাকতে পারে না। দু জনের পছন্দ অপছন্দ নিয়ে বাদানুবাদ বা তর্কাতকি হতে পারে না।** ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যাবে।

এ কাজটি ভাল	=	এ কাজটি আমি অনুমোদন করি
এ কাজটি ভাল নয়	=	এ কাজটি আমি অনুমোদন করি না

এ সমীকরণ মেনে নেওয়া যায় না। সে রকম

এ কাজটি ভাল	=	এ কাজ করবে
এ কাজটি ভাল নয়	=	এ কাজ করবে না

এ সমীকরণও মেনে নেওয়া যায় না। কেননা দুটি অনুজ্ঞার মধ্যে বিরুদ্ধতার সম্বন্ধ থাকতে পারে না (অনুজ্ঞা সম্পর্কে সত্য মিথ্যার কথাই ওঠে না)। কিন্তু মূল বাক্য দুটি—'এ কাজ ভাল', 'এ কাজ ভাল নয়' স্পষ্টতই পরস্পরের বিরুদ্ধ।

আবার, সব বাক্যে "ভাল"-এর বদলে 'অনুমোদ করি' আর "ভাল নয়"-এর বদলে 'অনুমোদন করি না' প্রয়োগ করা যায় না। কেননা আমাদের যে-কাজ করার সামর্থ্য আছে কেবল তার বেলাতেই অনুমোদন

---

* electro-magnetic

** রামের উক্তি : আমি চা পছন্দ করি, শ্যামের উক্তি : আমি চা পছন্দ করি না। এ উক্তি দুটির মধ্যে কি মতবিরোধ আছে?

করা না-করার কথা ওঠে। কিন্তু যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে তার সম্বন্ধেও সার্থকভাবে "ভাল", "ভাল নয়" এ কথাগুলি প্রয়োগ করা যায়। যথা, বলা যায়—

শীতকালে শীত পড়া ভাল
ভূমিকম্প কখনও ভাল নয়,

কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে,

শীতকালে শীত পড়া আমি অনুমোদন করি
ভূমিকম্প আমি কখনও অনুমোদক করি না।

এর থেকে বোঝা গেল "ভাল" আর "অনুমোদন করি", "ভাল নয়" (বা "মন্দ") আর 'অনুমোদন করি না' একার্থক বলে গণ্য হতে পারে না।

৫. বিষয়সাপেক্ষতাবাদ : মূল্য বিষয়গত (Objective value)

কোনো কোনো দার্শনিক বা দার্শনিকগোষ্ঠীর মতে—মূল্য সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত বা বিষয়গত ধর্ম। মানে, কোনো বস্তুর মূল্যবান হওয়া না-হওয়া আমাদের আবেগ-অনুভূতির—সমাদর অনাদর, বাসনাকামনা, সন্তোষ অসন্তোষের, ওপর নির্ভরশীল নয়। বস্তুর গুরুত্ব, বিস্তৃতি প্রভৃতি ধর্ম যেমন মনোনিরপেক্ষ বস্তুগত ধর্ম, মূল্য সেরূপ বস্তুগত ধর্ম। মূল্য যে কেবল আমাদের সমাদর অনাদর প্রভৃতি মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে না, তা নয়। মূল্য প্রত্যক্ষনিরপেক্ষও বটে। বলা বাহুল্য, এ মতে, মূল্যনিরূপক বাক্যও এক প্রকারের বর্ণনাত্মক বাক্য। এ মতকে বলে মূল্য সম্পর্কে বিষয়সাপেক্ষতাবাদ বা ব্যক্তিনিরপেক্ষতাবাদ*। উল্লেখযোগ্য যে, কেবল যে এক সম্প্রদায়ের বস্তুবাদীরা এ মত সমর্থন করে তা নয়, এদের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকরাও, বিষয়গত ভাববাদীরাও, এ মত সমর্থন করে।

বিষয়সাপেক্ষতাবাদীরা সকলেই মনে করে যে, মূল্য বিষয়গত ধর্ম। এ কথা ঠিক। কিন্তু মূল্য সম্পর্কে বহু প্রশ্নে এদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। যেমন, কেউ কেউ মনে করে—মূল্য হল প্রাকৃত ধর্ম। কেউ কেউ (বিষয়গত ভাববাদীরা) মনে করে—মূল্য হল আধিবিদ্যক (metaphysical) বা অতিপ্রাকৃত ধর্ম। আবার কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন, মূল্য হল অ-প্রাকৃত (non-natural) ধর্ম। যাঁরা মনে করেন মূল্য অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত ধর্ম তাঁরা বলেন : ইন্দ্রিয়ানুভব বা সাধারণ বুদ্ধিতে মূল্য ধরা যায় না ; বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা (intellectual intuition) নামক সাক্ষাৎকার হলেই মূল্য-অবধারণ হতে পারে।

উক্ত মতগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক কালের ইংরেজ বস্তুবাদী মূর-এর** মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এ মতটি একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব। মূর বলেন : মূল্য যথা—সৌন্দর্য, কল্যাণ, ইত্যাদি, বস্তুগত ধর্ম। মূল্যের অস্তিত্ব আমাদের সমাদর অনাদরের—এমন কি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপরও নির্ভর করে না। তাঁর মতে 'এ বস্তুটি ভাল' আর 'এ বস্তুটি লাল'—এ বাক্য দুটির মধ্যে একদিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই, দুটিই বর্ণনাত্মক বাক্য। তবে আর একদিক থেকে এদের পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। পার্থক্যটা হল এই : "লাল" বিশেষণটি বোঝায় কোনো প্রাকৃত ধর্ম, আর "ভাল" কোনো অপ্রাকৃত ধর্ম। 'এ বস্তুটি লাল' বললে, বলা হয়—এ বস্তুটিতে অমুক প্রাকৃত ধর্ম আছে, আর 'এ বস্তুটি ভাল' এ উক্তি করলে বলা হল—এ বস্তুটিতে আছে অমুক অপ্রাকৃত ধর্ম।

এ প্রসঙ্গে মূর বলেছেন : "ভাল", "সুন্দর" এ সব শব্দ অপ্রাকৃত-ধর্ম-নির্দেশক ; সুতরাং কোনো প্রাকৃত-ধর্ম-নির্দেশক শব্দ দিয়ে এ সব শব্দের সংজ্ঞা দিলে সংজ্ঞায় দোষ দেখা দেবে। তিনি এ দোষের নাম দিয়েছেন প্রাকৃতসম দোষ (naturalistic fallacy) (তিনি বলেন : অপ্রাকৃত ধর্মকে প্রাকৃতধর্ম মনে করা অবশ্যই একটা দোষ)। যথা, ধরা যাক, " ভাল"-র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হল

তাই ভাল যা সুখকর (বা হিতকর)।

মূরের মতে এ সংজ্ঞা প্রাকৃতসম দোষে দুষ্ট ; কেননা "ভাল" আর "সুখকর" (বা "হিতকর") সমার্থক বলে গণ্য হতে পারে না। পারে না, এজন্য : "ভাল" বলতে বোঝায় কোনো অপ্রাকৃত ধর্ম, আর "সুখকর" (বা "হিতকর") বলতে কোনো প্রাকৃত ধর্ম। মূর বলেন, "ভাল" যে ধর্ম বোঝায় তা এমন এক (অপ্রাকৃত) ধর্ম যা বিশ্লেষণ করা যায় না, যা সরল ও অনন্য। এ জাতীয় ধর্ম—মানে, মূল্য—ইন্দ্রিয়ানুভবে ধরা দেয় না, স্বজ্ঞাতেই এদের সাক্ষাৎকার হয়।

---

* Objectivist theory of value

** George Edward Moore (1873—1958)

মূল্য সম্পর্কে বিষয়সাপেক্ষতাবাদের সমালোচনা

মূল্য সম্পূর্ণরূপে মনোনিরপেক্ষ বা বিষয়গত ধর্ম—এ কথা মানা যায় না। মূল্য কেন, এমন কি ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য ধর্ম—রঙ, গন্ধ, স্বাদ, এ সবও সম্পূর্ণরূপে মনোনিরপেক্ষ কিনা তা ভাববার বিষয়। লাল রঙের কথাই ধরা যাক। বস্তুতে লালের বোধ উৎপাদনকারী কোনো শক্তি আছে, ঠিক। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, মন না থাকলেও, আমরা যে-লাল দেখি সে-লাল বস্তুতে তেমনভাবে থাকত কি? বিজ্ঞানীরা বলেন, অনুভবে যে-লাল পাই তা বস্তুর ধর্মের (লালবোধ উৎপাদনকারী শক্তির) ওপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনই আবার আমাদের ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, মনের ওপরও নির্ভরশীল। এজন্যই 'লাল', 'নীল', 'নরম,' 'গরম'—এ সব যে-ধর্ম বোঝায় তাকে লক "গৌণ গুণ" বলে বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় ধর্ম যদি সম্পূর্ণ মনোনিরপেক্ষ বলে গণ্য না হয়, তাহলে মূল্য মনোনিরপেক্ষ বলে গণ্য হয় কী করে?

মূর বলেন : মূল্য হল বস্তুগত-কিন্তু-অপ্রাকৃত ধর্ম। কিন্তু "বস্তুগত অপ্রাকৃত ধর্ম" কথাটি স্ববিরোধী বলে মনে হয়। যাকে আমরা বস্তু বলি তা—ঘরবাড়ি, গাছপালা এ সব—প্রাকৃত পদার্থ, প্রকৃতির উপকরণ বা অংশ। কাজেই "বস্তুগত" বলতে বুঝি : প্রাকৃত পদার্থস্থিত। কিন্তু প্রাকৃত পদার্থে (বস্তুতে) অপ্রাকৃত ধর্ম থাকে কী করে তা বোঝা শক্ত।

তারপর, মূর এবং আরো অনেক বিষয়সাপেক্ষতাবাদী মনে করেন—ইন্দ্রিয়ানুভবে বা সাধারণ বুদ্ধিতে মূল্য ধরা দেয় না। মূল্যের সাক্ষাৎকার হয় স্বজ্ঞা বা বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা নামক এক প্রকার সাক্ষাৎ-বোধের সাহায্যে। কিন্তু স্বজ্ঞার অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করে না। মনে হয়, মূল্য-অবধারণ ব্যাখ্যা করার জন্য স্বজ্ঞা বা বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা বলে এক বিশেষ বোধ স্বীকার করার দরকার নেই ; স্বজ্ঞা না মেনেও কী করে মূল্যের জ্ঞান হয় তা ব্যাখ্যা করা যায়। তারপর, স্বজ্ঞা বলে কোনো বিশিষ্ট বোধশক্তি যদি থাকেও বা, তাহলে তা একান্তভাবে ব্যক্তিগত বোধ। এ ব্যক্তিগত বোধশক্তি দিয়েই যদি মূল্যের বোধ হত তাহলে—মূল্যায়নে বস্তুত যে পরিমাণ একরূপতা দেখা যায়, তা দেখা যেত না। প্রসঙ্গত বলা যায়, মানবিক বুদ্ধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কান্ট্ বৌদ্ধিক স্বজ্ঞার কথা তুলেছেন। কিন্তু কান্টের মতে : মানুষের বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা বলে কোনো বোধশক্তি নেই।

আলোচ্য মতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল এই : এ মতবাদ বর্ণনাত্মক ও মূল্যনিরূপক বাক্যের পার্থক্য স্বীকার করে না ; এ মতে, মূল্যনিরূপক বাক্যও আসলে কেবল বর্ণনাত্মক। কিন্তু এ দু প্রকারের বাক্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। মূল্যনিরূপক বাক্যে কেবল কিছু বর্ণনা করা হয় না, এতে আমাদের সমাদর অনাদর, নিন্দা প্রশংসা, পছন্দ অপছন্দও—এক কথায়, মূল্যায়নও, ব্যক্ত হয়। যথা, 'মিথ্যা কথা বলা অন্যায়'—এ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, বক্তা মিথ্যা কথা বলা পছন্দ করে না। তারপর, বর্ণনাত্মক বাক্য বস্তুনিষ্ঠ, কিন্তু মূল্যনিরূপক বাক্য আদর্শনিষ্ঠ। যথা, যখন আমরা কোনো কিছুকে ভাল বলি তখন একটা আদর্শকে মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করি এবং ঐ আদর্শ অনুসারে মূল্যায়ন করি। বর্ণনা কিন্তু আদর্শ-নিরপেক্ষ। আর, মূল্যনিরূপক বাক্যে কিছুটা উচিতার্থক নির্দেশ থাকে, কিন্তু বর্ণনাত্মক বাক্যে এ জাতীয় কোনো নির্দেশ থাকে না। তারপর, মূল্যনিরূপক বাক্য কিছুটা অনুজ্ঞাবোধক, কিন্তু বর্ণনাত্মক বাক্যে কোনো অনুজ্ঞার ইঙ্গিত থাকে না। বিষয়সাপেক্ষতাবাদ মানলে বর্ণনা ও মূল্যনিরূপক বাক্যের পার্থক্য অগ্রাহ্য করতে হয়। কিন্তু এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। কাজেই মূল্য সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত, মূল্যনিরূপক বাক্য আসলে বর্ণনাত্মক—এ মতবাদ মেনে নেওয়া যায় না।

৬. মূল্য বিষয়গত না আত্মগত? (Subjective/ Objective)

মূল্য বিষয়গত না আত্মগত ধর্ম? মূল্য থাকে কোথায়—মূল্যায়িত বিষয়ে, নাকি যে মূল্যায়ন করে তার মনে? এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন, মূল্য সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত ধর্ম। আর কারও মতে মূল্য সম্পূর্ণরূপে আত্মগত ধর্ম। আমরা মনে করি— দুটি মতই চরম একপেশে। আমরা দেখাতে চেষ্টা করব : মূল্য বিষয়গতও বটে, আত্মগতও বটে ; মূল্যের অস্তিত্ব মূল্যায়িত বিষয়ের ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি আবার নির্ভর করে, যে মূল্যায়ন করে তার ওপরেও।

মূল্য বিষয়গত না আত্মগত? —অনুরূপ এ রকম আর একটা প্রশ্ন হল : ইন্দ্রিয়ানুভবে যে লাল নীল প্রভৃতি গুণ (ধর্ম) পাই সে সব বিষয়গত না আত্মগত? এ প্রশ্নটির জবাব দিতে পারলে তা অনুসরণ করে প্রথম প্রশ্নটিরও জবাব দিতে পারব। উদাহরণ হিসাবে কেবল লালের কথা ধরা যাক। লাল রঙ থাকে কোথায়—বস্তুতে না আমাদের মনে? এর উত্তর হল এই : লালের অস্তিত্ব নির্ভর করে নিম্নোক্ত শর্তগুলির ওপর—

(১) বস্তুস্থিত কোনো শক্তি, সামর্থ্য, শর্ত, বাহ্য পরিবেশের বিশেষ অবস্থা [বস্তুগত শর্ত]

(২) জ্ঞাতার চক্ষুরিন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক ও মনের বিশেষ অবস্থা [আত্মগত শর্ত]

এগুলি লাল (অনুভূত-লাল) রঙের আবশ্যিক শর্ত, আবার যুক্তভাবে পর্যাপ্ত শর্তও বটে। আমরা ঐ বস্তুটিতে লাল দেখি, বস্তুটির উপরিভাগ এক বিশেষ প্রকারের বলে—এতে এক বিশেষ শক্তি আছে বলে (অন্য প্রকারের, যথা নীলবোধ উৎপাদনকারী শক্তি থাকলে বস্তুটি লাল বলে অনুভূত হত না), বস্তুটির ওপর পর্যাপ্ত আলো পড়েছে বলে (আলো না থাকলে, লাল দেখা যেত না), আমাদের চোখ, মস্তিষ্ক, মন বিশেষ অবস্থায় আছে বলে (বর্ণান্ধ হলে, কামলা রোগ হলে, হয়ত নেশায় মত্ত হলে বা প্রলাপী জ্বর হলে, লালের বোধ হত না)। তাহলে, অনুভবগম্য লাল বস্তুস্থিত ধর্মের (শক্তির) ওপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনি জ্ঞাতার ওপরও নির্ভরশীল। মনে রাখতে হবে, প্রথম শর্তে যে বস্তুগত ধর্মের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের অনুভবগম্য লাল নয়, লাল বোধ উৎপাদনকারী কোনো শক্তি—বিশেষ পরিমাণের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপাদনকারী শক্তি বা সামর্থ্য। এ শক্তি লাল উৎপাদন করতে পারে—চোখ, মস্তিষ্ক, মনের সঙ্গে যুক্ত হলে ; নতুবা নয়। এ কথার মানে, অনুভবগম্য লাল যেমন বিষয়গত, তেমনি আবার আত্মগত ধর্ম।

আমরা বলেছি, ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া লাল থাকতে পারে না। এ উক্তি আপত্তিকর মনে হতে পারে। আপত্তি করে কেউ বলতে পারে : তাহলে, অন্ধকারে বস্তুর লাল রঙ কি মুছে যায়? যে দেশে কোনো চক্ষুষ্মান লোক নেই সে দেশে (যথা, এইচ. জি. ওয়েলস্ কল্পিত অন্ধদের দেশে) কি কোনো লাল বস্তু থাকতে পারে না? এ কথা কি বলা যায় না : ঐ অদেখা বস্তুটি লাল? যাঁরা এ আপত্তি তোলেন তাঁরাও মনে করেন না যে, অনুভূত-লাল ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া থাকতে পারে। তাঁদের আসল বক্তব্য হল : অদেখা বস্তুতেও লাল বোধ উৎপাদনের সামর্থ্য আছে। এ কথা মানতে বাধা নেই, এবং এ অর্থে বলা যায়, লাল বস্তুগত ধর্ম। এ অর্থে

ঐ অদেখা বস্তুটি লাল = যদি লাল-দেখতে-সক্ষম কোনো ব্যক্তি ঐ বস্তুটি দেখত তাহলে লাল দেখতে পেত।

আসলে "লাল", "নীল", "টক", "মিষ্টি"—এ সব দ্ব্যর্থক। যথা, "লাল" বলতে বোঝায় অনুভূত-লাল ; আবার, লাল উৎপাদনের সামর্থ্য। দ্বিতীয় অর্থে লাল বস্তুগত ধর্ম, কিন্তু প্রথম অর্থে লাল যেমন বস্তুগত তেমনি আত্মগত ধর্ম। "লাল" কথাটি আমরা প্রথম অর্থেই ব্যবহার করে আসছি।

লালের বেলায় যেমন বলেছি, মূল্যের বেলায় প্রায় তেমনভাবে বলতে পারি—মূল্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে নিম্নোক্ত শর্তগুলির ওপর :

(১) বস্তুস্থিত কোনো ধর্ম, বাহ্য পরিবেশের বিশেষ অবস্থা

(২) যে মূল্যায়ন করে তার ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, মনের অবস্থা

(৩) যে মূল্যায়ন করে তার আবেগ অনুভূতি—বাসনা কামনা, সমাদর অনাদর, সন্তোষ অসন্তোষ, শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি।

এদের প্রথমটি বস্তুগত শর্ত, আর শেষের দুটি আত্মগত শর্ত। আর এদের প্রত্যেকটি আবশ্যিক শর্ত। প্রথমে আত্মগত শর্তের কথা বলা যাক। ইন্দ্রিয়ানুভব না হলে, সুন্দর অসুন্দর, ভাল মন্দ—এ সব বিশেষণ প্রয়োগ করা যেত না (যে বস্তু কেউ দেখে নি, যে সঙ্গীত কেউ শোনে নি, তা সুন্দর বলে গণ্য হতে পারে না)। তারপর আমাদের বাসনা কামনা না থাকলে, আমাদের সমাদর করার, প্রশংসা করার বা সন্তুষ্ট

হওয়ার ক্ষমতা না থাকলে, কোনো কিছুকে সুন্দর বা ভাল বলতে পারতাম না—কোনো কিছুতে সৌন্দর্য বা ভালত্ব দেখতে পেতাম না। যথা, আমরা সোনা পছন্দ করি বলেই, সোনার প্রতি আসক্তি আছে বলেই, সোনার এত মূল্য। এর থেকে বোঝা যায়, মূল্য সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত ধর্ম—এ কথা মানা যায় না।

কিন্তু তাই বলে মূল্য সম্পূর্ণরূপে আত্মগত এ কথাও মানা যায় না। কেননা, মূল্যায়িত বস্তুতে এ সব আবেগ অনুভূতি—সমাদর অনাদর, প্রশংসা নিন্দা, সন্তোষ অসন্তোষ—উৎপাদনের সামর্থ্য না থাকলে আমরা বস্তুটি সমাদর অনাদর, পছন্দ অপছন্দ করতাম না। যেমন, আমাদের সন্তুষ্টিবিধান করে বলে, সমাদর আকর্ষণ করে বলে, ঐ কবিতাটিকে সুন্দর বলি। এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি এ কথাও ঠিক যে, কবিতাটিতে কোনো বিশেষ গুণ আছে বলেই তা আমাদের সমাদর আকর্ষণ করে। সকলে সোনা পছন্দ করে বলেই সোনা মূল্যবান—এ কথা ঠিক। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সোনায় মনোহারী ঔজ্জ্বল্য আছে বলেই সোনা পছন্দ করি, সোনা মূল্যবান মনে করি।

ওপরে যা বলা হল তার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে। কেউ বলতে পারে : আমাদের সুন্দর বা ভাল মনে না হলে কোনো জিনিস বস্তুত ভাল বা সুন্দর হতে পারে না, যে বস্তু কেউ দেখে নি তাতে সৌন্দর্য থাকতে পারে না—এ কেমন কথা? মনে করা যাক, সমুদ্রের অতলে এমন মণিমাণিক্য লুকিয়ে আছে যার সন্ধান মানুষ পায় নি। মানুষ সন্ধান পায় নি বলে এদের সৌন্দর্য থাকতে পারে না—এ কেমন কথা? এ আপত্তির উত্তর হল এই : "লাল" "মিষ্টি" প্রভৃতির মত "সৌন্দর্য", "সুন্দর", "ভাল"—এ সবও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। যথা, "সৌন্দর্য" বলতে বোঝায় : প্রথমত, অনুভূত সৌন্দর্য—যে সৌন্দর্য আবেগ অনুভূতিতে বা মূল্যায়নে ধরা দেয় ; দ্বিতীয়ত সৌন্দর্যবোধ উৎপাদনকারী কোনো বস্তুগত ধর্ম—সৌন্দর্যবোধ উৎপাদন করার সামর্থ্য। প্রথম অর্থে সৌন্দর্য আমাদের ভাল-লাগা, সমাদর-করা, ছাড়া থাকতে পারে না। মূল্যায়ন করতে পারে এমন লোক যে জগতে নেই সেখানে সৌন্দর্য (এই অর্থে) নেই। যাঁরা বলেন, সৌন্দর্য ও অন্যান্য মূল্য বিষয়গত, কেউ-দেখে-নি-এমন বস্তুতেও সৌন্দর্য থাকতে পারে, তাঁরা আসলে "সৌন্দর্য" কথাটি দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করেন। এ অর্থে

> সমুদ্রতলের অদেখা মণিমাণিক্য সুন্দর
>
> = যদি কেউ (মূল্যায়ন করতে পারে এমন কেউ) ঐ মণিমাণিক্য দেখত তাহলে ওগুলিকে সুন্দর বলত।

—বলত, কেননা ওগুলিতে সৌন্দর্যবোধ জাগাবার সামর্থ্য আছে। এ অর্থেই সৌন্দর্য, বা সাধারণভাবে মূল্য, বিষয়গত—এ কথা মানতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু 'মূল্য বিষয়গত' এ কথা বলতে যদি বোঝায় যে, মূল্য নামক কোনো মনোনিরপেক্ষ পদার্থ আছে তাহলে বলতে হবে—এ মত ভ্রান্ত। অনুভূত মূল্য মনোনিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে না, যেমন পারে না ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য লাল, নীল ইত্যাদি। সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত হয়ে থাকতে পারে—কেবল মূল্যবোধ-উৎপাদনকারী কোনো বস্তুগত ধর্ম বা সামর্থ্য ; যেমন, পারে—লাল নীল বোধ উৎপাদনকারী বস্তুগত শক্তি।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হল এই : মূল্য যেমন বিষয়গত তেমনি আত্মগতও। মূল্য বিষয়গত, কেননা : মূল্য নির্ভর করে মূল্যায়িত বিষয়ের কোনো বাস্তব ধর্ম বা সামর্থ্যের ওপর—যে ধর্ম* আমাদের সন্তোষ অসন্তোষ বিধান করে, সমাদর অনাদর উদ্রেক করে, প্রশংসা নিন্দা আকর্ষণ করে। আবার, মূল্য আত্মগত, কেননা : মূল্য নির্ভর করে, যে মূল্যায়ন করে তার ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ানুভব, বুদ্ধি ও আবেগ অনুভূতির ওপর; যে বিষয় কারও আবেগ অনুভূতি জাগাতে পারে না, প্রশংসা নিন্দা, সমাদর অনাদর, সন্তোষ অসন্তোষ, উদ্রেক করে না তা মূল্যহীন।

---

* মূল্যায়ন করতে পারে এমন মনের সংস্পর্শে এলে